International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-II, September 2016, Page No. 1-16
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দলিত : এক বিচ্ছিন্ন গোষ্টির ইতিহাস

মৌসুমী নাথ
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, এস. সি. দে কলেজ, কালীনগর, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

Abstract

The caste discrimination in Hinduism has doomed the glory of it over the years and still remains as a great thorn and mystery in the heart of mother India. The Rig Veda which is considered as the greatest among all vedas has implanted the seed of caste system in Hinduism. According to Rig Veda hymn, the different classes sprong from the four limbs of the creator. In order of precedence these are the Brahmins (prists & teachers), the Ksyatriyas (rulars & soilders), the Vaisyas (merchants & traders) and the Shudras (labour & artisians). The Brahmins and the ksyatriyas receives almost equal amount of respect at the society but the picture is completely different and frustrating for the other classes and this story of discrimination is a known fact. There is an another class which doesnot come under the above mentioned classifications. They are the "Untouchables". These people are the victim of injustice, social inequality and deprived from enjoying the basic human rights. The upper caste and the mainstream Hinduism have named them "Dalit". And they emerged as a fifth and bottom most caste as per the social hierarchy and status The Indian Govt. has recognized this class as the most deprived community and as a victim of the social evil. The nomenclature itself describes the sad story of their history and horrifying journey as a Hindu, all though the name "Untouchable" is constitutionally inappropriate but there is a justified logic and valid reason behind the naming of it. Literaturist Debesh has displayed the naked truth and the actual story of rejection in his book "Dalit". The realistic approach is justified with a nice mixture of biography, real life stories and poetries. The story teller has crafted the narration which shown the dark side of a Dalit's life and discusses the actual situation.

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আজও চতুর্বেদকে জীবনের আদর্শপন্থা হিসেবে অনুসরণ করে চলেছে বৈদিক শাস্ত্র আর্যদের দ্বারা নির্মিত হয়। তারা একসময় ভারতবর্ষে এসে আপন স্থাপত্য গড়ে তুলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রে আপন স্বার্থে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্মাণ করেন ঋগ্, সাম, যজু, অথর্ব। যে উদ্দেশ্যে তারা এই চতুর্বেদকে নির্মাণ করেন সেই উদ্দেশ্য একশ শতাংশ কাজে লাগলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর অপব্যবহারও দেখা যায়। সেই রকমই এক অপব্যবহারের প্রতিফলন দেখা যায় বর্তমান হিন্দু সমাজে। আলোচ্য প্রবন্ধ এই প্রতিফলনেরই একটি অংশ বিশেষ। যে ঋগ্বেদ হিন্দু সমাজের অমূল্যধন হিসেবে গ্রহণীয় সেই ঋগ্বেদেই হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাজন রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য এই চর্তুবর্ণের হিসেব নিকাশ ঋগ্বেদ থেকেই হিন্দুসমাজ জ্ঞাত হয় এই হিসেব নিকাশ যে সামাজিক সুযোগ সুবিধার আধারে নির্মিত তাতে সন্দেহ নেই। বিভাজন পদ্ধতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় ঋগ্বেদের আধারেই এবং

তারপর সামাজিক বৈষম্য ভেদে বঞ্চিত হতে থাকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষরা। দিনের পর দিন শোষিত হতে হতে একটা সময় তারা তাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা অর্জন করে। প্রতিমুহূর্তের অপমান প্রথম প্রথম তাদের আত্মসম্মানের দর্পণে আঘাত হানলেও জীবন ধারণের তাগিদে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু তারা সহ্যের আওতায় নিয়ে আসে। একটা সময় এমন হয় যে তারা জানতে শুরু করে অপমান মেনে নেওয়ার রীতিই তাদের জীবন ধারণের আসল রীতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য এই চর্তুবর্ণের সামাজিক হিসাব নিকাশ সম্পর্কে আমরা সকলেই জ্ঞাত। কিন্তু এই চর্তুবর্ণের বাইরেও যে এমন কিছু মানুষের অস্তিত্ব সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে তাঁর কথা কি আমাদের পাঠক মন্ডল জানেন অথবা সে সম্পর্কে খবরাখবর রাখার কোনো আগ্রহতা কি আছে বর্তমান বর্ণবৈষম্য হিন্দু সমাজের? যদি থাকত তবে আজকের এই সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তারা অবহেলিত কেন? সেই অনালোকিত বঞ্চিত মানুষের জীবন স্বার্থের উদ্দেশ্যে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টাতেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। হিন্দুসমাজে চর্তুবর্ণের বাইরে যারা রয়েছেন তাদেরকে পঞ্চম স্থান দেওয়া যেতে পারে এবং তারা সমাজে 'দলিত' হিসেবেই পরিচিত। যদিও বর্তমান সংবিধান এই শব্দটিকে গ্রহণ করেনা তথাপি এরা সামাজিক মর্যাদায় দলিত হিসেবেই পরিচিত। 'দলিত' শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃতের ক্রিয়া বিশেষণ থেকে গৃহীত হয়েছে যার অর্থ বিভাজিত, খন্ডিত তাড়িত। জ্যোতিরাও ফুলে উনবিংশ শতাব্দীতে অস্পৃশ্য প্রথার ভিত্তিতে 'দলিত' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন এই বিভাজিত শ্রেণির উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষে দলিতদের অবস্থা এতটাই করুণ যে এদেরকে মানুষ বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে কী না তাও পাঠক মনে প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে।

বর্তমান সাহিত্যিক দেবেশ রায় বঙ্গবাসী হয়েও সহমর্মী হয়ে ছুটে যান এই দলিতদের কাছে যারা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কর্মসূত্রে তিনি তাদের কাছে পৌঁছতে পারেন এবং জানার আগ্রহ তাকে পৌঁছে দেয় দলিতদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনে। কলকাতার একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে সাহিত্যিক দেবেশকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যিক দেবেশের উদ্দেশ্য কেবল খবরাখবর সংগ্রহ করা নয়, ভারতবর্ষের অবহেলিতদের সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে আনাও তাঁর স্বভাবগত ধর্ম। সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে দেবেশ রায় দেখলেন ভারতবর্ষ কেবল ভৌগোলিক সীমারেখাতেই একটি অখন্ড রাষ্ট্র, ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্পন্ডল তো অন্য কথাই বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক সামাজিক গোষ্টির আলাদা আলাদা ভারতবর্ষ রয়েছে। দেবেশ রায়ের ভাষায়, "ইংরেজি জানা আমলাদের এক ভারতবর্ষ আছে, ইংরেজি-জানা সমাজবিজ্ঞানী বা ভাষাবিজ্ঞানীদের একটা ভারতবর্ষ আছে, হিন্দি জানা বিদ্বানদের একটা ভারতবর্ষ আছে, আঞ্চলিক ভাষাগুলির একটা ভারতবর্ষ আছে, বৃহত্তম ব্যবসায়ীদের একটা ভারতবর্ষ আছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের একটা আছে, শ্রমজীবী মানুষদেরও একটা ভারতবর্ষ আছে, রাজনৈতিক দলগুলির একটা আলাদা ভারতবর্ষ আছে, বিভিন্ন উপভাষারও একটা নিজস্ব ভারতবর্ষ আছে।" চমকিত দেবেশের চোখে যখন ভারতবর্ষের বর্তমান নগ্ন বাস্তব ধরা দেয় তখন তিনি এর ইতিহাস অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং সেই অনুসন্ধানের সাথে সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিয়তি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যাই হোক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লাভ হয় সেগুলিরই সামান্য কিছু সংকলন তিনি 'দলিত' প্রবন্ধে করেছিলেন। অস্পৃশ্য প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই দলিত গোষ্টি অত্যাচারিত নিপীড়িত, শোষিত। দয়া পওয়ার নামক এক মারাঠি লেখকের আত্মজীবনীমূলক রচনাই দেবেশের চিন্তাজগতে এই ভাবনার জন্ম দেয়। আশ্চর্যের বিষয় দেবেশ লক্ষ্য করেন দয়া পওয়ারের আত্মজীবনী ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না। পড়তে পড়তে তিনি বুঝতে পারেন এই ভাষাতেও রয়েছে প্রতিবাদী চেতনার ছোঁয়া যা ইংরেজি ভাষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। হিন্দু সমাজের এমন কিছু অস্পৃশ্য মানবগোষ্টির কথা এই আত্মজীবনীতে রয়েছে যার বর্ণনা ঠিকঠাক মত বাংলাতেই করা যায় না তার জন্য অন্য ভাষায় শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের হয়ে হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে দলিত আন্দোলন শুরু করেন। তবে উল্লেখনীয় যে এই আন্দোলনে

তিনি 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করেননি, এই আন্দোলনে তিনি 'সত্যাগ্রহ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি মহার গোষ্টির হয়ে অস্পৃশ্যপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেও পরবর্তী কালে এই আন্দোলনের রূপ বৃহৎ আকার ধারণ করে। শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর সংগত কারণও রয়েছে। গবেষণা করে জানা যায় শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বজুড়ে দলিতরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এমন কী যে পাশ্চাত্য দেশ আধুনিকতার রোমাঞ্চকর হাওয়া তৃতীয় বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশগুলির জন্য বয়ে আনে সেই পাশ্চাত্য দেশেও দেখা যায় সাদা-কালোর বিভেদ। মহারাষ্ট্রের মহার সম্প্রদায়ের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের দলিতরা ধরা দেয় এই আন্দোলনে। বাবা সাহেবের অক্লান্তকর লড়াইয়ে যোগদান করে সকল বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিতরা। আদি কর্ণাটক, আদি-দ্রাবিড়, আদি-অন্ধ্র ইত্যাদি বাসীরা যারা দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা প্রত্যেকেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আবার কিছু কিছু দলিত সম্প্রদায় ভারতবর্ষে এর প্রকোপ বেশী বলে দেশ ছেড়ে সিঙ্গাঁপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, ইউনাইটেড কিংডম ইত্যাদি স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। বাবাসাহেবের উদ্দীপনায় দলিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে সেইসঙ্গে প্রচার ঘটে ঐক্যতার বাণীর। গ্রামবাসীরা আপন অধিকার ছিনিয়ে নিতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সেই তাগিদেই ছুটে যায় শহরে। দেখতে গেলে ৬০% শিক্ষিত দলিতরাই ছিল গ্রামবাসী। ফলে বাবাসাহেবের আন্দোলন আরও তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে তারা আন্দোলন করেন বর্ণ হিন্দু সমাজের ভেদ-বিভাজনের বিরুদ্ধে, তারা আন্দোলন করেন বর্ণ বিভাজন সৃষ্ট করা বেদের বিরুদ্ধে যার সুযোগে সমাজের উচুতলার লোকেরা শোষণ করার নানা পথ বের করে। বাবাসাহেবের উদ্যোগে সেই পিছিয়ে পরা মানুষদের সমাজে যথাচিত স্থান দেওয়ার কাজ 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের ফলে শুরু হয়। বর্ণহিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বাবা সাহেবকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের যে সমস্ত কারণ বাবাসাহেবের ভিতর কাজ করছিল সেগুলো দেবেশ রায় নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"দলিতরা, মহাররা, বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি থেকে বর্ণ হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীয় ভিতের উপর আক্রমণ ঘটাতে পারলেন, আবার সেই হিন্দু সমাজের অন্তর্গত থেকেই তারা এপিক ও পুরাণের বিকল্প পাঠ তৈরি করে হিন্দুসমাজের ভিতর অর্ন্তঘাত ঘটাতে পারলেন। 'আক্রমণ' করা যায় বাইরে থেকে, আক্রমণকারী হিসেবে দলিতরা হিন্দু সমাজের বাইরে, তাঁর জন্মচক্রে বিশ্বাসের বাইরে, তাঁর পূর্বজন্মের পাপপূণ্য আর পরজন্মের কর্মফলের বৃত্তের বাইরে। আর 'অর্ন্তঘাত' ঘটানো যায় ভিতর থেকে, অর্ন্তঘাতক হিসেবে দলিতরা হিন্দু সমাজের ভিতরে নিজেদের মাটি ছাড়েননি, তাঁদের নতুন এপিকের বিষয়সীমা, একলব্য, শম্বুক। হিন্দুধর্মের সঙ্গে দলিতদের সম্পর্কের এই উভবলিতা দলিত আন্দোলনের সবচেয়ে জোরের জায়গা।" (পৃঃ ৭)

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে দলিতদের আত্মপরিচয় অর্জনে কোনো সমস্যা এসেছিল কি না তাঁর সঠিক অনুমান করা যায় না। তবে তারা বর্ণ হিন্দু প্রথাকে আক্রমণ করতে পেরেছিল খুব শক্তভাবেই। বাবাসাহেবের অনুগামীরা যখন এই আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যান তখনই ১৯৬৬ ড. বি. আর. আম্বেদকর দেহত্যাগ করেন। তবে এই দেহত্যাগের সাথে সাথে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়নি। বাবাসাহেবের অনুগামীরা নিজেদের দলিত হিসেবে অস্বীকার করল এবং 'আম্বেদকরপন্থী' হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করল। সরকার যখন অস্পৃশ্যপ্রথার বিলোপ সাধনে 'দলিত' শব্দের পরিবর্তে Schedule Tribe এবং Schedule Caste শব্দের ব্যবহার করেন এবং দলিত শব্দটিকে অসাংবিধানিক শব্দ হিসেবে ঘোষণা করেন তখন ছত্তিশগড় সরকার 'দলিত' শব্দটিকে সরকারী শব্দ হিসেবে নিষিদ্ধ করেন। অস্পৃশ্য প্রথা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রয়োজন পড়ে দলিত সাহিত্যের। কারণ ইতিহাস ছাড়া কোনো আন্দোলনই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আর ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে চিরস্মরণীয় করতে পারে একমাত্র সাহিত্যই। তাই নির্মিত হলো দলিত সাহিত্য। কিছুটা আন্দোলনের স্বার্থে আবার কিছুটা আত্মপ্রয়োজনের তাগিদে। দেবেশ রায় 'দলিত' প্রবন্ধের ভূমিকায় এমন অনেক দলিত সাহিত্যিকের উল্লেখ করেন। মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করে তেলেগু, তামিল, কন্নড়, মলয়ালম ও গুজরাটি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সমস্ত ভাষাভাষীর দলিত গোষ্টি মিলিত হয়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দলিত আন্দোলন শুরু করে।

"নাগরাজ ত সারা দক্ষিণ ভারতের দলিত সাহিত্যকে তিনটি ছকে ভাগ করতে চান। মারাঠি ছক-সেখানে শুদ্রতাবাদ তাঁর কাজ করেছে, কন্নড় ছক-বেদবিরোধী সাহিত্যচর্চার রীতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মলয়ালম ছক – বহুধর্মের ফলে যেখানে দলিত সাহিত্য স্থানীয় সামাজিক বিষয়কেই অবলম্বন করছে, যার ফলে অন্য ধরণের প্রতিবাদী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যখুব স্পষ্ট থাকছে না।" (পৃঃ ৮)

তবে দলিত সাহিত্যের মধ্যে মারাঠি সাহিত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

দলিত গোষ্টি ভারতীয় সমাজের চিরকালই অবহেলিত হয়ে এসেছে। এই অবহেলিত প্রকার যদিও ভিন্ন ছিল তথাপি অবহেলাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। বাবাসাহেবের উদ্যোগের পর বহু প্রাতিষ্ঠানিক মানুষ এই বিষয়ে এগিয়ে আসেন। যেমন গান্ধীজি বর্ণহিন্দু প্রথাকে অস্বীকার না করে পঞ্চম বর্ণকে 'হরিজন' বলে সম্বোধন করেন যার অর্থ ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তিনি ব্যক্ত করেন। অস্পৃশ্য প্রথাকে দূরে সরিয়ে অস্পৃশ্যদের যথোচিত সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত গান্ধী নীতি সঠিক জায়গা পায়নি। কারণ এতে পঞ্চমবর্ণকে হিন্দুবর্ণে না মিলিয়ে আরও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার রাজনৈতিক গন্ধ পেয়েছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। যাইহোক বাবাসাহেবের উদ্যোগতায় দলিত আন্দলনের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনকারীরা এবং দলিত সাহিত্যিকরা নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে অনেকটাই সফল হয়। যদিও আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর উত্তর আধুনিক যুগেও দলিতদের প্রতি বর্ণহিন্দু সমাজের দৃষ্টি ততটা সুস্পষ্ট নয় তথাপি দলিতরা এখন আর পিছিয়ে থাকার না। ২০১৪র তথ্য অনুযায়ী অমিতাভ কুন্ডুর (Minister of Minority Affairs) মন্ত্রীত্বে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে ৪৪.৮ শতাংশ সিডিউল্ড ট্রাইব এবং ৩৩.৪ শতাংশ সিডিউল্ড কাস্ট তখনও আর্থিক দিক দিয়ে নিম্নসীমারেখারও নীচে বাস করে। কিছু হিন্দু দলিত সফলতার চরম শিখর লাভ করতে পারলেও অধিকাংশ দলিত নিম্নসীমার নীচে এখনও বাস করে। ১৯৯১র তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় দলিতরা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করার পর তাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি কি সহজেই তাদের পিছনে ছেড়ে দেবে? তাই নির্যাতনের প্রকার কেবল বদলে যায়। ২০১১ (Census Report) তথ্য অনুযায়ী ৭৯ শতাংশ আদিবাসী দলিত এবং ৭৩ শতাংশ অন্যান্য দলিতরা নিজ স্থায়ী গার্হস্থ্য জীবন থেকে বঞ্চিত। তাদের কোনো স্থায়ী রোজগারও দেখা যায় না দিন মজুরীর কাজগুলো যেন তাদের জন্যই রক্ষিত থাকে। একমাত্র এই কারণে দেখা যায় ২০১২ তে কর্ণাটকে ৯৩ শতাংশ দলিত অর্থগত দিক দিয়ে নিম্ন সীমারেখার নীচে বাস করে।

দলিত সম্প্রদায় বর্ণ হিন্দু দ্বারাই অধিকতর বঞ্চিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে দলিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব হিন্দু ধর্মেই আছে। বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মগোষ্টিও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৯০র তথ্য অনুযায়ী কোন ধর্মগোষ্টিতে কেমন সংখ্যক সিডিউল্ড ট্রাইব এবং সিডিউল্ড কাস্ট রয়েছে তাঁর একটা আনুমানিক তথ্য নীচে দেওয়া হল—

Religion	Schedule Caste	Schedule Tribe
Hinduism	22%	9%
Buddhism	90%	7.40%
Christianity	9%	33%
Sikhism	31%	0.9%
Zoroastrianism	--	16%
Jainism	--	2.6%
Islam	--	--

প্রাচীন সভ্যতায় দলিতদের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ। সেই চর্যাপদের সময়কাল থেকেই তারা করুণ ইতিহাস বয়ে চলেছে। সমাজ থেকে গ্রাম থেকে দূরে তাদের অবস্থান। সমাজের ভিতরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বরাবরই তাদের রয়েছে। তাদের স্পর্শে উচ্চশ্রেণির ধর্ম পালনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে তাঁর জন্য নানা রকম বিধি নিষেধ দলিতদের

উপর আরোপ করা হয়। যেমন – তৎকালীন প্রচলিত চন্ডাল শ্রেণি বা অন্য কোন তাঁর সম শ্রেণিরা গ্রাম থেকে দূরে থাকত এবং কোন কারণবশত একই পথ যদি সার্বজনীন থাকত তবে সেই পথ ব্যবহার করতে তাদের অত্যন্ত সাবধান ভাবে থু থু ফেলার জন্য গলায় কলসী ও পদ চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য কোমরে ঝাট নিয়ে যাতায়াত করতে হত। এই চন্ডাল শ্রেণিগোষ্টি পরবর্তীতে ডোম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ডোম শ্রেণিগোষ্টির আরও একটি কাহিনি প্রাচীন গ্রন্থে (চর্যাপদে) পাওয়া যায়। যে ডোমদের স্পর্শে জাতিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ডোম নারীদের সাহচর্য পেতেই গ্রামের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ পন্ডিতরা ডোম কুটীরে রাতের অন্ধকারে ছুটে আসেন এবং এতে তাদের জাতিচ্যুত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ডোমদের সর্বদাই ঘৃণাচোখে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ এই ডোম জাতি ছাড়া সমাজের কোনো কল্যাণকর (যেমন- অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া) কাজই হয় না। আসলে বেদ সাহিত্যেই এমন কতগুলো শ্রেণিগোষ্টির নাম রয়েছে যারা প্রথম থেকেই অন্ত্যজ শ্রেণি হিসেবে পরিচিত।

বাবাসাহেবের মত অনুযায়ী অস্পৃশ্য প্রথার জন্ম হয় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির আধিপত্যে এই প্রথার ক্রম অগ্রসরমান রূপ দেখা যায়। চর্যাপদের সময় এর চূড়ান্ত রূপ পাওয়া যায়। ভক্তি আন্দোলনে এই প্রথার বিরোধিতা করেন বহু বিচক্ষণ পন্ডিত। একনাথ তাদেরই একজন যিনি ব্রাহ্মণ হয়েও বিচ্ছিন্ন দলিতদের হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। রামানন্দ (১২৯৯) ভক্তি আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সমস্ত অস্পৃশ্যদের জন্য ধর্মপালনের দ্বার খুলে দেন। তাঁর প্রিয়শিষ্যরা ছিলেন- রাইদাস (হরিজন) কবীর (জুলাহা), ধন সেনা (নাধু), পীপা (রাজপুত), ঘন্না (জাট), সুতরাং দেখা যায় সমস্ত গোষ্টি সম্প্রদায় নিয়েই তাঁর ধর্মপালন এগিয়ে যায়। এরপর চতুর্দশ শতকে দেখা যায় আন্দোলনকারী কবীরকে তিনি ১৪২৫-এ জন্ম গ্রহণ করেন এক বিধবা নারীর গর্ভে। সামাজিক অপমানের কারণে মাতা তাকে ত্যাগ করেন। জন্ম বৃত্তান্তই যার এমন করুণাময় সে তো সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাধ্য। জাতপাত, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দলিতদের তিনি সমাজে জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। ১৪৮৬তে নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করা চৈতন্যদেবের কথা সকলেরই জ্ঞাত। তিনি চন্ডালের সাথে বসে এক থালে খেয়েছেন। ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে দলিতদের সমাজে জায়গা বানানোর চেষ্টা করা হয়। চোখমেলা এই ভক্তি আন্দোলনের সময় আবির্ভূত হন, তিনি প্রথম দলিত লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রাইদাস দলিতদের হয়ে সমাজে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি নিজে মুচি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই দলিতদের মনঃ বেদনা তাঁর অজানা নয়। রাইদাস কিংবা গুরু রবিদাস যে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার সমাজে ঘটান তাতে অস্পৃশ্যপ্রথার বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠে। দলিত সমাজে তাঁকে গুরুর দরজা দেওয়া হয়। তাঁর চিন্তা-চেতনা শিখ্ ধর্ম গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' থেকে উঠে আসে কিন্তু তিনি তৎকালীন সমাজে তাঁর যথাচিত মর্যাদা পাননি। পনেরোশো শতকে সন্ত শ্রীরামানন্দ রায় সর্ব ধর্মে এবং সর্ব জাতে সম্মতি জানিয়ে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণিকে কাছে টেনে নেন। মধ্যযুগে ঘটে যাওয়া এই ভক্তি আন্দোলনে বহু সন্ত এই অস্পৃশ্য প্রথাকে দূরে ঠেলে দেন। হিন্দু দলিতরা আন্দোলনের মাধ্যমে তখন বার বার জানতে চাইছিল যে তারা 'হিন্দু' না 'অহিন্দু'। তারা প্রথাগত ভাবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান মানতে থাকে।

গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনে নিয়ে দুটো পৃথক ধর্মের সূচনা ঘটান-বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম। উনিশ শতকে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্যসমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন দলিতদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত প্রতিবন্ধকতাকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসে। ১৯২৮-এ Wardha-তে হিন্দুদের উচ্চ শ্রেণির জন্য নির্মিত 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' মন্দির দলিতদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সময় যত এগিয়ে যায় দলিত সম্প্রদায়রা ততটা স্বাভাবিক জীবনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তথাপি আজও তারা তাদের যথোচিত জায়গা পেতে পারেনি।

জাতিভেদ প্রথার তীব্র প্রকোপ দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে। কেরলে বর্ণ হিন্দু সমাজে নিম্ন শ্রেণির মানুষদের উপর অত্যাচারের কোনো সীমা নেই। প্রথা অনুযায়ী কেরলে নিম্ন শ্রেণির মানুষরা উচ্চ শ্রেণি থেকে সর্বদা একটা দূরত্ব মেনে চলে। পূর্বে তাদের ৯৬ ফুট Nambudiris, ৬৪ ফুট Naris এবং ৪৮ ফুট অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায় থেকে দূরত্ব

মেনে চলতে হত। নিম্নশ্রেণির লোকেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমন কী পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা তাদেরকে অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় দেওয়া হত। ১৯ শতকে এই সমস্ত কিছুর পরিবর্তন আনার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে কেরলের সমস্ত মন্দির বর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র অস্পৃশ্য প্রথার বিলুপ্তি সাধনে।

পাঞ্জাবের Talhan Gurdwara তে ঘটে যায় প্রায় একই রকমের ঘটনা। বর্ণ বিভাজিত হিন্দু ধর্মের মত শিখ্ ধর্মেও এর প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। Talhan-গ্রামে জাট শিখ ও চামার সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব আজকের নয়। চামার সম্প্রদায়কে সর্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করাই যেন জাট, শিখের লক্ষণ। চামার সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা এই বিক্ষোভের বিস্ফোরণ একদিন ঘটারই কথা ছিল। ২০০৩-এ Talhan-এ দেখা যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা শীতল যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে জাট, শিখ ও চামার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের আনয়ন ঘটে এক পবিত্র স্থানকে কেন্দ্র করে। বলা হয় যে তীর্থস্থান কিংবা কোনো পবিত্র স্থানের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার থাকে। কিন্তু পাঞ্জাবের Talhan-এ এর অন্যরূপই দেখা যায়। চামররা এর প্রতিবাদ করতে সেদিন জাট শিখদের মুখোমুখি হয়েছিল। শহীদ বাবা নিহাল সিং-এর নামে তৈরি পবিত্র স্থান নিয়ে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা পরবর্তীতে দলিতদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। জাট শিখ সম্প্রদায়ের জমিদার পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের নামে বাড়িয়ে যাচ্ছিল তাঁর সম্পত্তির ভান্ডার। সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির লোকদের সমস্ত প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে মালিক সম্প্রদায় তাঁর মালিকানার অপব্যবহার করছিল। একমাত্র সেই কারণেই চেতনার স্ফুরণ ঘটে চামার সম্প্রদায়ের মধ্যে। চামাররা বাবা নিহাল সিং-এর নামে নির্মিত পবিত্র স্থানের মালিকানার অংশীদার হতে চাইলে তাদেরকে তাড়িত করা হয়। কিন্তু এই তাড়নার যথাযোগ্য কোনো কারণ জাট, শিখরা দেখাতে পারেনি। সেখানে গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ চামার সম্প্রপদায় দিয়ে তৈরি সেখানে চতারাই মালিকানার অংশীদার হতে পারবে না এ কেমন আইনসঙ্গত কথা? তাই সমাজের তথাকথিত জনগণ জাট শিখদের বিরুদ্ধে বিচার চাইতে মহামান্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পবিত্রস্থানের নামে এবং জনসাধারণের কল্যাণার্থে দেশ-বিদেশ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৬-৭ কোটি টাকা সময়ে সময়ে আসে। এই বিশাল পরিমাণ আর্থিক যোগানের অধিকাংশই তখন মালিক সম্প্রদায় সোগ্রাসে আত্মসাৎ করেন। জনসাধারণের উন্নয়ণের কাজে সামান্য অংশও খরচ করা হয় না। গ্রামের ৬০ শতাংশ চামারদের নিজেদের উৎসব পালনের জন্য জাট, শিখদের কাছে টাকা চাইতে হয় এবং সেই টাকার কখনও তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়নি। চামার সম্প্রদায় নিজেদের মালিকানার অধিকার চাইতে আইনের দারস্থ হলে জাট, শিখ জমির মালিক এবং অন্যান্য উঁচু সম্প্রদায়ের সংস্থাগুলো একত্রিত হয় চামারদের বিরুদ্ধে। তারা এই সমস্যার গুরুগম্ভীর রূপকে হালকা করে দিতে তারা পবিত্র স্থানটির নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা সরকারকে দেখায়। গতিকেই Talhan-গ্রামে উন্নতিও সরকারের চোখে পড়ে এবং অন্যান্য বিষয় এর সামনে অনেক ছোট হয়ে যায়। ফলে চামারদের মালিকানা পাওয়ার প্রশ্নে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। Talhan Dalit Acrion Committee-র President-এর বক্তব্য—

> *"We fought a war for Swabhiman (self-respect). The teachings of Guru Rabidas and the access to modern education inculcated in us this desire. We are an economically independent community; many of our people are noise who sends money from Dubai, the West, etc. Here, we do not work for landlords, we are self-employed. Like any other caste, we too are the offspring of Punjab we drink its water, we live on its food. We are as good as anybody."*

Talhan গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান এবং নিহাল সিং-এর পবিত্র স্থানের মালিকানার একজন অংশীদার ভূপেন্দ্র সিং-এর বক্তব্য— *"Every Sunday, the gulak was opened of the Rs. 5-7 lakh in offerings, Rs. 1-2 lakh was pilfered. The committee was against having chamars as members as it was an old*

tradition. It is wrong to think like that. The dalits got very upset when they asked for some money to celebrate their festivals and the committee dominated by us doled out just Rs. 10,000 – Rs. 15,000. The dalits wanted to become part of the committee; they fought a four year battle in court. Today, with the dalits around, everyone keeps a watch and corruption in the shine has been cubed…"

ভূপেন্দ্র সিং-এর আরও কিছু বক্তব্য—

> *"Those earlier notions of untouchability, which was a Brahmanical concept, no longer prevail. Earlier, poor chamar families were dependent on us, for example. For taking the molasses' waste. Now they stand equal to us, with many of their children becoming class I officers carning fat salaries, while the soms of landlords refuse to work on the land, the children of the chamars study and get good jobs. In contrast, our sans are getting hooked to drugs as they idle their time away,…"*

চামার সম্প্রদায় গোষ্টি দীর্ঘ চার বছর ধরে জাট শিখদের বিরুদ্ধ আইন সঙ্গত লড়াই করে গেছে। আদালতের দারস্থ হয়ে সমস্ত আইন মেনে লড়াই করলেও তারা তাদের প্রাপ্য জায়গা ঠিকঠাকভাবে পায়নি। এরই ফলস্বরূপ চামার সম্প্রদায় ষড়যন্ত্রে আবদ্ধ হল। ক্ষমতাশালীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা তাদের স্বাভাবিক জীবন প্রণালীতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বন্ধ করে দেওয়া হয় তারপর শুরু হয় পাশবিক অত্যাচার। কিল, চড়, লাথি তারপর কাঁচের বোতল, ইট, পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয় চামারদের উপর। দু-দলের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষের পর চামার সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেদিন এই শোষিত দলিতগোষ্টি নিজেদেরকে, নিজেদের সমাজকে শোষক দলের বিরুদ্ধে স্লোগান গেয়ে রঙিন করে তুলেছিল।

খ্রিস্টান ধর্মেও একই অবস্থা। দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টান ধর্মগোষ্টি বর্ণ হিন্দু সমাজের দ্বারা প্রভাবিত। তারা বিভাজিত প্রক্রিয়াকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক স্তর বিন্যাস অপরিবর্তিত থেকে যায় যেমন গোয়ান (Goan) এবং মাঙ্গলোরিয়ান ক্যাথলিক (Mangolorean latholico)-দের সামাজিক স্তর বিন্যাস। ১৯৯২-এর ভারতীয় ক্যাথলিকদের ইতিহাস থেকে জানা যায় তামিল নাড়ুতে দলিত খ্রীষ্টানদের চার্চের প্রবেশাধিকার নিষেধ করা হয়, তাদের বঞ্চিত করা হয় যীশুখ্রীষ্টের আরাধনা সম্পর্কিত যে কোনো কাজে যেমন- শোভাযাত্রা, গীর্জা পাঙ্গন সাজানো ইত্যাদিতে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। বর্তমান ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায়কে নীচু দেখাতে কিংবা বানাতে কোনো ক্ষেত্রেই ছাড়েনি। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক পটভূমিকাতেও চেতনার বিস্ফোরণ অবশ্যই ঘটে। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বহু রাজনৈতিক সংগঠন। দলিতরা গড়ে তোলে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল। বর্তমান ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্রে সকলের অধিকার সমান। এর প্রমাণ পাওয়া যায় গড়ে ওঠা নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপরিচয়ে। দলিত সম্প্রদায়ের স্বার্থে গড়ে ওঠা বর্তমান ভারতবর্ষের কতগুলি রাজনৈতিক দল হল—বহুজন সমাজ পার্টি, রিপাব্লিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া (মহারাষ্ট্র), লোক জনশক্তি পার্টি (বিহার) বহুজন শক্তি পার্টি (নেপালি), দলিত জনজাতি পার্টি (নেপাল), ইত্যাদি। উল্লেখিত দলগুলো দলিতদের হয়ে নিজেদের অধিকার সমাজ থেকে ছিনিয়ে নিতে কঠোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিপরীত দিকেও এর উদ্যোগতা রয়েছে। অর্থাৎ সমাজে মালিকানার অধিকারে যারা খ্যাত, জাত-পাতে যারা নিজেদেরকে সংগ্রামের পথকে এমনি ছেড়ে দেননি। তাই দলিত বিরোধী কিছু দলও সমাজে অবস্থান করে। বিহারের প্রতাপশালী রণবীর সেনা উঁচু সম্প্রদায় দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। তারা দলিতদের বিরুদ্ধে সমানভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায় এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এক তীব্র অশান্তির সৃষ্টি করে। এই রণবীর সেনা সরকার দ্বারা বেআইনি দল হিসেবে ঘোষিত হয়। ১০১৫-র তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় Cobra

port এক লজ্জাজনক ঘটনার উদ্ঘাটন করে। তথ্য অনুযায়ী মুরলী মনোহর যোশী, সি.পি.ঠাকুর এবং Former P.M. Chandra Shekhar প্রমুখ বিজেপি নেতারা দলিত হত্যাকান্ডে রণবীর সেনার সাথে সমানভাবে যুক্ত ছিলেন। এত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়ার পরও নীতিশ কুমার, লালু প্রসাদ যাদব এবং রাবড়ী দেবীর মত খ্যাতনামা নেতারা পে করে থাকেন। দলিতদের নৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার যেন তাদের নেই অথচ এরাও দলিত সম্প্রদায়েরই একজন প্রতিনিধি।

যাইহোক ভারত সরকার আজ কোনো সম্প্রদায়কেই আর পিছিয়ে থাকতে দেখতে চান না। তাই শিক্ষাক্ষেত্র হোক আর চাকুরী ক্ষেত্রেই হোক পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়দের জন্য আলাদা করে কোঠা (Quota) reserve থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও দেখা দিল আরেক ধরণের রাজনীতি। যে দলিতদের সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছিল সেই দলিতদের মধ্যেই অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকল বহু উঁচু সম্প্রদায়ের জনজাতির। সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করার লোভী মনোভাব নিয়ে তারা নিজেদেরকে দলিত হিসেবে ঘোষণা করল। তাই রাজনৈতিক অনুশাসনও তাদের পিছু ছাড়তে নারাজ।

বর্তমান ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরা দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসেন। বাবু জগজীবন রাম (Deputy Prime Minister of India) দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে এসে ১৯৭৭-এর ২৪ মার্চ থেকে ১৯৭৯-এর ২৮ জুলাই পর্যন্ত তাঁর CFD পার্টিকে জনসম্মুখে দাঁড় করান। ১৯৭৭-এ K.R. Narayanan ভারতবর্ষের প্রথম দলিত President হিসেবে নিযুক্তি পান। দলিত সম্প্রদায়ের Balakrishnan ২০০৭-এর ১৪ জানুয়ারী ভারতবর্ষের Chief Justice হিসেবে নিযুক্তি হন। ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) বেশ কয়েকজন নেতা বর্তমানে দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসেন যেমন— Ramchandra Veerappa এবং Dr. Suroj Bhan। ২০০৭ সালে উত্তর প্রদেশে মায়াবতী Chief Minister পদে নিযুক্ত হন। দলিত সম্প্রদায়ের হয়েও তিনি আপন যোগ্যতায়ই এই পদাধিকার লাভ করেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে দলিত সম্প্রদায় বলেই তিনি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। ১৭ শতাংশ ভোট মুসলমান সম্প্রদায় থেকে, ১৭ শতাংশ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং বাকী ৮০ শতাংশই দলিতদের ভোট পান মায়াবতী। মায়াবতীর রাজনৈতিক জীবনের সফলতার কারণে তাকে নিয়ে বহু মতবাদ গঠিত হয়। অনেকের ধারণা মায়াবতী ভারতবর্ষের Prime Minister পদের উত্তরাধিকারীর পদে ভবিষ্যতে নিযুক্তি পেতে পারেন। সিনেমার জগতেও দলিতদের একই অবস্থা। দক্ষিণ ভারতে যেহেতু বর্ণ বিভাজনের প্রচলন অধিক সেই কারণে দলিত সম্প্রদায় থেকে কোনো ব্যক্তি সিনেমা জগতে উঠে আসবে তা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। 'বলিউড' জগতে কিংবা অন্যান্য সিনেমার জগতে দলিতরা কখনও প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। সিনেমা জগতে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে এমন একজন অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীকে পাওয়া মুশকিল যে দলিত জনগোষ্টি থেকে উঠে এসেছে। দলিত রামবিলাস পাশোয়ানের পুত্র চিরাগ পাশোয়ান তাঁর কেরিয়ারের প্রারম্ভ ঘটান হিন্দী সিনেমার মাধ্যমে। তাঁর প্রথম সিনেমা ২০১১-য়। কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রভূমি পরিস্ফুট থাকা সত্ত্বেও সিনেমাটি সফলতা লাভ করতে পারেনি। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়েও চিরাচরিত প্রথাকে তারা পরিবর্তন করতে পারেনি। সিনেমার সার্থকতা না আসায় দলিত চিরাগ পাশোয়ানের যোগ্যতা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ২০১১র পর থেকে আর নতুন কোনো সিনেমার জন্য তাকে নির্বাচন করা হয় না। চিরাগের শিশুবেলা বলিউড জগত তাঁর কাছে স্বপ্নের জগতের সমান ছিল অথচ বর্ণবিভাজন প্রথা তাঁর এই স্বপ্ন জগতকে ভেঙ্গে চূড়মার করে দেয়। বর্তমান হিন্দি সিনেমার জগতে এমন অনেক চলচিত্র প্রকাশিত হয় যেখানে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে আনা হয়। যেমন- একলব্য: দি রয়াল গার্ড (২০০৭), আরক্ষণ (২০১১) এবং মাঝি দি মাউন্টেন ম্যান (২০১৫); চলচিত্র জগতে দলিত সম্প্রদায়ের এই বঞ্চনা দলিত দর্শক মন্ডলীর উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য করে। ২০১১র জনগণনা তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে দলিত সম্প্রদায়ের যে বহুলতা রয়েছে তাঁর অধিকাংশই রয়েছে নিম্নলিখিত রাজ্য জুড়ে।

উত্তরপ্রদেশে	২০.৫% এস সি
ওয়েস্ট বেঙ্গল	১০.৭% এস সি
বিহার	৮.২% এস সি
তামিল নাড়ু	৭.২% এস সি

পাঞ্জাবে দলিতদের সংখ্যা অনেক বেশি, প্রায় ৩১.৯% মিজোরামে এদের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। দিনের পর দিন এই দলিতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু সে অনুযায়ী সরকারী খাতায় তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ছে না। সরকারী খাতায় আগে যেটুকু Reservation তাঁদের জন্য নির্ধারিত ছিল Population বেড়ে যাওয়ার পরও সীমিত সংখ্যাই তাদের Reservation থেকে যায়। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী মায়াবতী এই বিষয়টিকে সংবিধানে বহু পূর্বেই পেশ করেছিলেন কিন্তু ভারত সরকার তা নিয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত নেয়নি। তাছাড়া দিনের পর দিন সরকারী সংস্থানগুলো যেভাবে বেসরকারী হয়ে উঠছে সেই অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জাতিদের আলাদা করে সুযোগ সুবিধা আর দেওয়া হচ্ছে না। গতিকেই দলিতরা ঘুরে ফিরে আবার একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়।

এবার সাহিত্যে আসা যাক। বাবাসাহেবের উদ্যোগতায় দলিতরা নিজসাহিত্য গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং সেই তাড়নাতেই ১৯৬৫-র ডিসেম্বরে প্রথম দলিত সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু বাবাসাহেবের মৃত্যুতে সেই সাহিত্য সভায় বিঘ্ন ঘটে এবং বিষয়টা কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। ১৯৫৮ তে পুনঃবার সেই সভার আয়োজন করা হয়। আন্না ভাউ সাঠে, শঙ্কররাও খরাট, বাবুরাও বাগুল এরা দলিত সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে ষাটের দশকের শুরু এবং শেষ সাহিত্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শুরুর সাহিত্যকে দলিত সাহিত্য বললে এতটা চিহ্নিত করা যায় না কিন্তু ষাটের দশকের শেষ থেকে যে সমস্ত সাহিত্য রচনা শুরু হয় সেগুলোই দলিত সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। আন্না ভাউ সাঠে যে সমস্ত গল্প, কবিতা, কৌতুক লিখতেন সেগুলোতে দলিত বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠত না। সমাজ বাস্তবতাকে প্রধান করে তুললেও দলিতদের তিনি পৃথক করে সাহিত্যে তুলে ধরেননি। তাই তিনি দলিত সাহিত্য সমাজে ততটা গৃহিত নন। তবে তাঁর সমকালীন দু'জন সাহিত্যিক শঙ্কররাও খরাট এবং বাবুরাও বাগুল দলিত সাহিত্য সমাজের পথিকৃত দিক্ দর্শক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এদের রচনার দলিতদের মনের কথাই বেরিয়ে এসেছিল। দলিত সাহিত্য ভান্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যেন প্রাণ ফিরে পায় শঙ্কররাও ও বাবুরাওয়ের রচনায়, দলিত সাহিত্য ভান্ডার গড়ে ওঠার পিছনে আরও দু'জনের নাম পাওয়া যায় জ্যোতিবাফুলে, এস. এম. মাটে। এরা উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারক আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বাবুরাও বাগুল 'যখন আমি জাত লুকিয়েছিলাম' গল্প সংকলন বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র সাহিত্য ভান্ডারে যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে। দলিত সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে যেন মুহূর্তে নগ্ন হয়ে যায়। দলিত সাহিত্য সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের দলিত হিসেবে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা এবং বর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজে প্রবেশে অস্বীকার করা। দলিত সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এম. এন. ওয়াঙ্খাড়ে বলেছিলেন—

> *"রামায়ণ-মহাভারতে দলিত সাহিত্য নেই, দলিতদের আলাদা সাহিত্য তৈরি করতে হবে- মার্কিন দেশের কালোদের মত"।*

১৯৬৮তে ঔরঙ্গাবাদ থেকে প্রকাশিত গঙ্গাধর পন্তওয়ালের 'অস্মিতাদর্শ' পত্রিকাটি দলিত সাহিত্যের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। নামদেও ধাসাল, অর্জুন ডাঙলে, জে.ভি. পওয়ার, দয়া পওয়ার, উমাকান্ত রণবীর, রামদাস সোরতে এরা সবাই দলিত সাহিত্য আন্দোলনে যোগদান করেন। তারা স্বাধীনতা দিবসকে কালোদিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করতে আহ্বান জানালেন। ১৯৭২-এ প্রকাশিত হল নামদেও ধাসালের কাব্যগ্রন্থ 'গোলপিঠা'। কাব্যগ্রন্থটি পরিষ্কার ভাষায় দলিতদের আত্মসমর্পণেই প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথে দলিত সাহিত্য যেন আরও একটু জোর পেয়ে গেল। দলিত সাহিত্য দিনের পর দিন নিত্য সাহিত্য ভান্ডারকে পরিস্ফুট করলেও এই সাহিত্য ভান্ডার সম্পর্কে

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখনীয় যে, কোনো উপন্যাস এখানে সফলতা লাভ করতে পারেনি। আত্মজীবনীই দলিত সাহিত্যের মুখ্য সম্পদ। এ নিয়ে সাহিত্য সমাজে প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে। দলিত সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে দেবেশ রায়ের সম্মুখে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে তা হলো দলিত নারীদের আত্মকথা। শোষিত শ্রেণির মধ্যে এই নারীরা আরও শোষিত বলে তাঁর নিজেদেরকে আর দলিত বলতেও নারাজ। দলিত নারীরা কেবল সমাজের তথাকথিত উঁচু লোকেদের দ্বারা নির্যাতিত হয় না তারা দলিতদের দ্বারাও শোষিত হয় অথচ এই দলিতরাও অন্য আরেক গোষ্টি দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত। দলিত মহিলারা তাই নিজেদের নিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে আর চর্চা করতে চায় না কারণ তারা এতে পীরামুক্ত নয় বরং আরও পীড়িত হয়। তাদের একজন কবির কাতর প্রার্থনা সাহিত্যিক দেবেশ তাঁর সংকলনে উল্লেখ করেছেন—

ভগবান খান্ডবার কাছে
.....
.....
দুনিয়ার সামনে আমাদের আর ন্যাংটো কোর না।[১] (অনুরাধা গুরব)

ড. বি. আর. আম্বেদকর দলিত আন্দোলন শুরু করেন দীর্ঘদিনের প্রত্যাখ্যানের পর। এই প্রত্যাখ্যাত শুধু তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়েছে। বাবাসাহেব জানতেন তাঁর একার পক্ষে এর প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। তাই সমস্ত দলিত সম্প্রদায়কে একত্রে আনার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। বর্ণ হিন্দু সমাজে এই দলিতরা এতটাই প্রত্যাখ্যাত যে জলপান করার ক্ষেত্রেও তাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। মহাড়-এর চাভাদর লেক থেকে বর্ণ হিন্দু সমাজ দলিতদের জল পানে নিষিদ্ধ করলে তা থেকেই বাবাসাহেবের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বাবাসাহেব এক সত্যাগ্রহ সমিতির আয়োজন করে সকল দলিতদের সেই সভায় আহ্বান জানান। ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই সভায় বাবাসাহেবের বক্তৃতা অবিস্মরণীয় হয়ে ইতিহাসের পাতায় থেকে যায়। সেদিনের বক্তৃতা সমস্ত দলিতদের একত্রে করে তীব্র বিক্ষোভে আলোড়িত করে তুলেছিল। বাবাসাহেবের বক্তৃতায় ঘুমন্ত মানব মন সেদিন উত্তেজিত হয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইয়ঠে। সমস্ত যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যে আলোচনা তিনি সর্বসম্মুখে তুলে ধরেছিলেন তাতে চেতনার স্ফুরণ না হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি সেদিন বর্ণ হিন্দু সমাজের প্রতি যতটা না বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়েছিলেন একটা সুস্থ মানবসংঘঠন গড়ে ওঠার দিকে। তিনি হিন্দুদের চর্তুবেদকে সম্মান জানান, হিন্দু ধর্মের দয়া, পরোপকার, জীবে প্রেম, নিঃস্বার্থবান ইত্যাদি বিষয়কে স্মরণে করিয়ে যে বক্তৃতা পরিবেশন করেন তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় দলিতদের কাছে। দীর্ঘদিনের পীড়া থেকে আত্মমুক্তির তাগিদে সকলেই একসূত্রে বেঁধে পড়ল ২৭ ডিসেম্বরে। সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষ কেন তৃতীয় বিশ্বের একটি অংশ হয়ে পড়ে রইল এই কারণের পিছনে যে কিছু অংশ হলেও এই বিভাজন পদ্ধতি। তা প্রমাণিত হল। ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কী করে এত উনতিমানের তাঁর তুলনামূলক আলোচনা হল বক্তৃতা সভায়।

হিন্দুধর্ম চর্তুবর্ণে বিভাজিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সমাজে যার মাথায় মুকুট থাকবে সে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রাজা আর যার হাতে ধনুক থাকবে সে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান। এছাড়া বাকী যারা আছেন তারা সমাজের নীচুস্তরের লোক হিসেবে পরিচিত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের সেবা করেই তারা পুরোজীবন কাটিয়ে দেয়। হিন্দু সমাজে এই চতুবর্ণ ছাড়াও কিছু লোক থাকেন যারা বিচ্ছিন্ন অথচ গ্রামের কাজকর্ম তাদেরকে ছাড়া হয় ও না এরাই বর্তমানে দলিত হিসাবে পরিচিত। ফ্রান্সে এই বর্ণহিন্দুদের মত বিভাজন পদ্ধতি রয়েছে, তারা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মত এর মধ্যে দুটো শ্রেণি এবং বৈশ্য, শূদ্র, অতিশূদ্র মিলিয়ে অন্য আরেকটি শ্রেণি। ফ্রান্সের সংসদে এই শ্রেণি বৈষম্যকে রদ করার জন্য যে অধিবেশনের আয়োজন করা হয় তাতে ঐ সময় আয়োজনকারীদের নিন্দা প্রচুর হয়। ঐ সভার পর অভিজাতবর্গকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সাধারণ মানুষরা অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধের ঘোষণা করে। সে সময় এই ঘটনাগুলোর নিন্দা যথেষ্ট পরিমাণে হলেও বর্তমান শান্তিপূর্ণ ফ্রান্স কিন্তু তারই প্রতিফলস্বরূপ। ফ্রান্সের এই ঘটনা সমগ্র বিশ্বে বিপ্লব এনেছিল। প্রায় প্রত্যেকটি দেশই নজির বহন করে। এই ঘটনার পর বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের জন্য সতেরোটি ঘোষণা লাঘু করা হয়। সাহিত্যিক দেবেশ তাঁর সংকলনে ছটি ঘোষণা উল্লেখ করেছেন—

"১. জন্মের পর কোনো মানুষই সমান...
এ ব্যাপারে কোনো রকম পার্থক্য হলে, তা হবে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতেই, তাঁর জন্মের জন্য নয়।" (পৃঃ ২৯)

বাবাসাহেব ফ্রান্সের মতই আমাদের দেশে বিপ্লব আনতে চান। যার ফলস্বরূপ গঠিত হবে একটি সুস্থ মানবগোষ্টি। তখন মানুষ ঐহিক চিন্তা ছেড়ে সমগ্রের উন্নতির চিন্তা করবে। ছোট কথা ছোট চিন্তা ছেড়ে বিশেষের দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের সার্বভৌমিক রাষ্ট্র আজকে দুর্দশার যে চরম শিখরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর একমাত্র কারণ এই বর্ণ বিভাজন পদ্ধতি। বর্ণবিভাজনের ফলে মানুষ মানুষকে কেবল পিছন দিকেই টেনেছে, কখনও এগিয়ে দেয়নি। আর এক বিশাল জনগোষ্টি যখন শুধু পিছন দিকেই যাবে তখন তা থেকে দেশের উন্নতি কী করে হবে। এর প্রতিকার হিসেবে বাবাসাহেব তাই সমগ্র দলিত গোষ্টিকে এগিয়ে আসতে বলেছেন। তিনি গোড়া থেকে এই বিভাজন পদ্ধতিকে নির্মূল করতে চেয়েছেন অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে। অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে একটি গোষ্টি অপর গোষ্টিকে জানার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকের আচার অনুষ্ঠানের আদান-প্রদানের ফলে সৌভ্রাতৃত্ববোধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একটা সুস্থ মানবগোষ্টি। এভাবেই বাবাসাহেব অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করে সমাজকে একটি বর্ণে এবং সমতল প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

দেবেশ রায়ের 'দলিত' সংকলিত গ্রন্থে তিনি কতগুলো আখ্যানের সংকলন করেছেন। আখ্যানগুলোর গভীরতা পাঠকমন্ডলীর শরীরে শিহরণ জাগাতে বাধ্য। কতগুলো আখ্যানের আলোচনা নিম্নে দেওয়া হল।

অর্জুন ডাঙলে দলিত সাহিত্যের অগ্রভূমি, পশ্চাৎপটভূমি, সাহিত্যের সম্ভাবনা, উদ্দেশ্যমূলক রচনা এবং সাহিত্যকেন্দ্রিক নানারকম রচনা নিয়ে 'দলিত সাহিত্য: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' আখ্যানটি রচনা করেন। দলিত সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন এরপর এই আখ্যানমূলক রচনায় তিনি তৎপর হয়ে উঠেন অস্পৃশ্য প্রথা গোড়া থেকে কীভাবে নির্মূল করা যায় তাঁর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে এই জাতিভেদ প্রথা আজকের বিষয় নয় বিষয়টি বহু প্রাচীন এবং এর সৃষ্টি কর্তা যে আসলে কে তা সঠিক ভাবে খুঁজে বের করা বর্তমানে কঠিন। এমন কী যে 'মনুস্মৃতি'-র তীব্র নিন্দা দলিত সম্প্রদায় করে থাকেন সেই 'মনুস্মৃতি'-র তীব্র নিন্দা দলিত সম্প্রদায় করে থাকেন সেই 'মনুস্মৃতি'ও যে এর উদ্ভাবক নয় তাও প্রমাণ করেন অর্জুন ডাঙলে। ঋষি মনু এই বর্ণ বিভাজনের উগ্র সমর্থক ছিলেন। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে চারটি বর্ণ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ঋগ্বেদে আছে দৈববাণী অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্মলাভ করেন, ক্ষত্রিয়রা ব্রহ্মার কাঁধ থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে এবং শূদ্ররা পায়ের নীচ থেকে জন্মলাভ করে। ঋগ্বেদের এই তথ্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা রাজসভায় আদেশ জারি করলে ক্ষত্রিয়রা তা কার্যে পরিণত করেন। ব্রাহ্মণরা খুব শীঘ্রই একত্রিত হয়ে নিজেদের আধিপত্য সমাজে বিস্তার করে নেন। ক্ষত্রিয়রা এতে সমর্থক জানিয়ে নিজ শক্তিবলে আধিপত্য বিস্তারের চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর এই গোষ্টির আধিপত্যের আলোড়নে বৈশ্য ও শূদ্রের মত ক্ষুদ্র স্বার্থে বেঁচে থাকা ব্যবসায়ী ও শ্রমিকগোষ্টি চাপা পড়ে যায়। দিনের পর দিন তারা অবহেলিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণরা নিজ স্বার্থে ঋগ্বেদের সহায়তায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানারকমের আইন সমাজে জারি করতে থাকেন। ক্ষত্রিয়দের চেষ্টায় সেই সমস্ত আইনের সেবায় এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এতটাই দৃঢ় হয়ে পড়ে যে তাঁর প্রতিবিম্ব আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় উচ্চবর্ণের প্রতাপতত্ত্বে নিম্নবর্ণের লোকেরা দিনের পর দিন আরও পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং এক সময় তারা অস্পৃশ্যজাতিতে পরিণত হয়।

অস্পৃশ্যরা তৎকালে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় ছিল। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক ইত্যাদি নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় এই তাদের জীবন। শোষণের এক অভিশপ্ত রূপ এইভাবেই ভারতবর্ষে লালিত হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে শোষণরূপ বৃক্ষ তাঁর মূল সহ সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব শুরু করে। পৌরাণিক কথা, ধর্মীয় গ্রন্থ ও বিভিন্ন শাস্ত্রাদির ছত্রছায়ায় এই সমস্ত শোষণ ক্রিয়া যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করছিল ঠিক তখনই আগমণ ঘটল ব্রিটিশদের, নাড়া পড়ল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রিটিশরা তাদের সাথে নিয়ে আসল শিল্প বিপ্লব। জাত-পাতের বিভেদের চেয়ে তখন অনেক বেশী জরুরী হয়ে পড়ল ব্যবসায় মুনাফার হিসেব নিকেশ করা। শোষণতার রূপ পাল্টালো। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৮-১৮৯০) সেই সময়কার একজন সমাজ সংস্কারক যাকে জাতি ভেদ প্রথা স্পর্শ করতে পারেনি, যার মনে প্রাণে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টিকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে হবে। ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) জ্যোতিবাফুলের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর পাশে ছিলেন।

কিছু কিছু গবেষক মনে করেন এই জ্যোতিবাফুলেই দলিত সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটান। আবার কারও কারও মতে ভক্তি আন্দোলনেই এর জন্ম। কেউ কেউ বলেন সন্ন্যাস কবি চোখামেলার কবিতার মাধ্যমে দলিত সাহিত্য ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। এস. এম. মাটে ও (১৮৮৬-১৯৫৭) এই সাহিত্যের সূত্রপাত হতে পারেন। এই সমস্ত নানারকম তর্ক বিতর্ক সাহিত্য সমাজে চলতে থাকে। অপরদিকে বাবাসাহেব সমস্ত দলিত গোষ্টিকে একত্রিত করার জন্য পত্র পত্রিকায় নানারকম লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। মারাঠী ভাষায় বিভিন্ন রচনা এবং ইংরেজিতে তাঁর লেখা প্রকাশ হলে দলিত পাঠক মন্ডলী একত্রিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় দলিত একত্র করার জন্য বিভিন্ন সভার আয়োজন করেন এবং তাতে মূল্যবান বক্তৃতা পরিবেশন করেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বর্ণ বিভাজন পদ্ধতিকে এমন ভাবে আক্রমণ করেন যে তিনি দলিত সাহিত্য জগতে এক তীব্র আন্দোলন তুলতে পারেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতাকে সবাই তখন মেনে নিয়েছিল। বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যজগতে আলোড়ন আনতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তাঁকে দলিত সাহিত্যের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাবাসাহেবের চেষ্টায় ১৯৪৫-এ বোম্বাইতে 'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সঙ্গে 'সিদ্ধার্থ' কলেজ স্থাপিত হয়। বাবাসাহেব এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলিতদের শিক্ষিত হওয়ার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা করে দেন, কিছু কিছু দলিত সেসময় উচ্চবর্ণকে নকল করে সাহিত্য রচনা করা শুরু করে। বাবাসাহেবের উদ্দেশ্য কিন্তু তা ছিল না। তিনি একটি সুস্থ সক্রিয় মানবগোষ্টি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে থাকবে নিজস্বতা, কোনো নকল নবিশের জায়গা এখানে তিনি দিতে চান না। ড. আম্বেদকরের চেষ্টায় এক অখন্ড মানব গোষ্টি গড়ে উঠতে পারত কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এতে চির ধরল উঠে মারাঠা দলিত সংঘ সমগ্র দলিত গোষ্টির মঞ্চ হয়ে উঠে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল রিপাব্লিকান পার্টি। বাবাসাহেবের মৃত্যুর পর এই পার্টি সর্বাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছু কিছু নেতা মনে করলেন এই পার্টির সঙ্গে কমিউনিষ্টদের যোগসূত্র স্থাপন হতে পারেনা। আবার কেউ কেউ উপলব্ধি করলেন মার্ক্সবাদ এর সঙ্গে জড়িত। আম্বেদকরের চিন্তা চেতনা স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই কোনো ইজম বা মতবাদ এর সঙ্গে জড়িত হতে পারেনা।

সংকলক দেবেশ দলিত সাহিত্যের ভূমিকা ও সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে কিছু কিছু বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন—

"১. ভারতীয় সামাজিক প্রথায়... বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়।" (পৃঃ ৫৬)

উল্লেখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিষয়ের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ হওয়া উচিত বলে দেবেশ রায় মনে করেন। যেমন—

"সামাজিক অবিচার... পরিহার করা উচিত।" (পৃঃ ৫৭)

দলিত সাহিত্য তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেই সাহিত্য আভ্যন্তরীণ কিছু দ্বন্দ্ব ছিল। মহাত্মা গান্ধি ও আম্বেদকর পন্থী দুটো দলে বিভক্ত ছিল দলিত গোষ্টি, মহাত্মাগান্ধি অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা আয়ত্তে আনতে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনে দলিতরা বিশেষ আকৃষ্ট হননি কারণ এর বিপরীতে ছিলেন বাবাসাহেব। তিনি নিজে একজন মহার ছিলেন এবং দলিতদের অধিকাংশই মহার গোষ্টি থেকে উঠে আসা। তাই দলিতরা স্বাভাবিক ভাবেই আম্বেদকর পন্থীতে যোগদান করলেন। কিন্তু কিছু লোক গান্ধিবাদীতেই থেমে থাকলেন। ফলে দলিত সাহিত্য কিছু লোক থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। বাবাসাহেব গান্ধিবাদকে সমর্থন করেননি কারণ তাঁর ধারণা কংগ্রেস পার্টি পুঁজিপতি শ্রেণির দ্বারা তৈরি, পুজিপতিদের জন্য তৈরি। তাই বিচ্ছিন্ন দরিদ্রদের ব্যথা তারা কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারবে না। অপরদিকে এমন কিছু সম্প্রদায় রয়ে গেছে যারা কোনো দলই যোগদান করেনি। চামার, আদিবাসী, মাং, ধোর, হোলার, রামোশি, ভিল, যাযাবর, নান্দিয়াল প্রভৃতি সম্প্রদায়গোষ্টি। তারা কোনো আন্দোলন করলেন না কারণ তাদের নিজেদের কিছু পেশা ছিল এবং মহারদের মত তাদের গ্রামের উচ্চবংশীয়দের উপর নির্ভর করতে হত না। তারা তাদের মত করে উচ্চবংশীয়দের সাথে আপস করে নেয়। তাদের মতে অনেকেই বর্তমানে শিক্ষিত শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছেন তবে সাহিত্যজগতে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করেননি। তাই দলিত সাহিত্য আবারও কিছু গোষ্টির ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হল।

দলিত আন্দোলন যেভাবে শুরু হয়েছিল দলিত সাহিত্য ও একইভাবে শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সাহিত্যে আর আগের মনোভাব খুঁজে পাওয়া যায়না। সমস্ত উত্তেজনা ও বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে সাহিত্য জগতে জোয়ার এনেছিল এই দলিত সাহিত্য। বর্তমানে সেই উত্তেজনা হারিয়ে গেছে। দলিত সাহিত্যে এখন কেবল পাওয়া যায় প্রতিযোগিতা। উচ্চ শ্রেণির কাছে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার তাগিদ নিয়ে সমস্ত সাহিত্যিকরা রচনামুখী হয়ে উঠছেন। দেবেশ রায়ের মতে ঝড়ের পর যে শান্ত পরিবেশ প্রকৃতি জুড়ে থাকে সেই পরিবেশটাই দলিত সাহিত্যে বর্তমানে দেখা যায়। তবে সংগ্রাম যাতে থেমে না যায় এবং এই সংগ্রাম সর্বান্তকরণে সফলতা অর্জন করতে পারে এমনও কিছু সাহিত্যিক প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করে চলছেন।

সংকলক দেবেশ রায় তাঁর 'দলিত' গ্রন্থে এমন কিছু আখ্যানের সংকলন করেছেন যেগুলো একদিকে দলিত সম্প্রদায়ের বাস্তবিক ধ্যান ধারণাকে স্পষ্ট করে অন্যদিকে দলিত সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এমনই একটি আখ্যান মরাঠী সাহিত্যিক বন্ধুমাধব দ্বারা রচিত হয়েছিল। বন্ধু মাধবের 'রুটি' আখ্যানটির আয়তনে অত্যন্ত ছোটো কিন্তু এর বাস্তবিক রূপ পাঠক মন্ডলীর শরীরে শিহরণ জাগায়। আখ্যানটির বক্তা অতীতের কোনো স্মৃতিকে যখন মন্থন করছিলেন ঠিক তখনই আখ্যানটির অবতারণা। দলিতরা সবমাত্র একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছে। সেইসময়টা জীবন ধারোণ করা যে কতটা মুশকিল তা এই 'রুটি' আখ্যান থেকে অনুমান করা যায়। একটা ছত্রাক পড়ে যাওয়া পচা দুর্গন্ধময় রুটি যে কতটা বিষাক্ত, তা যে কেবল মানুষের প্রাণ হরণ করে না তা নয় সমগ্র দলিত গোষ্টির হৃদয়ে ঘা দিতে পারে তাঁর প্রমাণ বন্ধুমাধব দিয়েছেন। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বক্তা ও তাঁর অভিভাবক যখন মালিক শ্রেণির কাছে পরিশ্রমিক হিসেবে কিছু ফসল চান তখন তাদের ভাগ্যে জুটে বিষাক্ত পঁচা রুটি যা গৃহপালিত পশুও খেতে অস্বীকার করে। বিষাক্ত পচা রুটি আর মৃতপশুর মাংস দিয়ে রাত্রিতে বক্তার পরিবারের মহাভোজ সম্পন্ন হয়। বক্তার কাছে তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট তারপরও এমন ঘটনাকে সে আটকাতে পারেনি। কিন্তু দাদুকে হারাবার পর বক্তার মনে তাঁর কথাগুলো যে দাগ কেটেছিল এবং মহারদের হয়ে লড়াই করবার প্রতিনিধিত্ব যে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠছিল এর কিঞ্চিত[১১] ইঙ্গিত আখ্যানে পাওয়া যায়। বক্তার অভিভাবকের শেষ কথাগুলি—

"আমাদের এই জাতপাত বাঁধা বহু পুরনো পচা রুজি রোজগারের মধ্যে তুমি আর থেক না। যতদূর পার লেখাপড়া কর। এই অভিশপ্ত রুটি তুমি আর মহারদের মুখে তুলতে দিওনা। এই বিষাক্ত রুটিই একদিন মানুষের মনুষ্যত্বকে মেরে ফেলবে...।"

ভীমরাও শিরওয়ালের 'জীবিকা' আখ্যানটি মরাঠী বিচ্ছিন্নদের মর্মান্তিক বাস্তবকে তুলে ধরে। পেটের ক্ষিধের তাড়না মানুষকে যে, কোনো কাজ থেকেই বিরত রাখে না তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় এই আখ্যানে। শত অপমান, শত লাথি চেয়েও যে বড় সত্য পেটের ক্ষিধে তারই একটি উদাহরণ 'জীবিকা' আখ্যান। জনকবাইয়ের কন্যা কাশী ও ধর্মের সুখের সংসারে পেটের ক্ষিধেই আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ধর্ম উত্তেজনার বশে বেয়াইনী কাজ করে বসলে তাকে হাজতে যেতে হয়। অপরদিকে কাশী একা হয়ে গেলে তাঁর উপর দৃষ্টি পড়ে পুরুষ নামক শোষক সম্প্রদায়ের এখানে কাশী নিম্নশ্রেণির শোষিত সম্প্রদায়ের হয়েও এদের মধ্যে নেই। অর্থাৎ কাশী শোষিতদের দ্বারাই শোষিত। এদের কথা সাহিত্যে তুলে ধরার মত ভাষাও নেই। ভীমরাও শিরওয়ালে এমনই একটি দলিত নারীর বেদনা তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন। নিজের লজ্জা, আত্মসম্মান বাঁচাতে কাশীকে কেশু নামক এক হিংস্র, দানবীর চেহারা বহনকারী এক ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। কেশু একদিকে যেমন হিংস্র অন্যদিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক। কাশীর রূপ যৌবনে সে যেমনি লালায়িত তেমনি বিবাহের পর সেই রূপ যৌবন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সে হিংসাত্মক। তাই কাশীর শরীরে অত্যাচারের নিশান বসিয়ে সে যেন স্বস্তির নিঃস্বাস নেয়। কেশু পুনঃবার হাজতে গেলে কাশী মনে মনে ভাবে এবার বুঝি তাঁর মুক্তি। সহজ সরলা কাশী ভাবতে পারে না যে হিংস্র কেশু সহজে তাঁর পিছনে ছাড়বে না, তাই যাবার আগে সে তাঁর বীজ রেখে গিয়েছিল। অর্থাৎ কেশুর সন্তান কাশীর গর্ভে ছিল। দীর্ঘসময় গর্ভে এই সন্তান রাখার পর প্রথম যখন কাশী তাঁর মুখখানা দেখল তখন ঘৃণায় অপমানে তাঁর হৃদয় এস্ত ন্যস্ত হয়ে যায়। কারণ সন্তানটি কেশুর প্রতিবিম্ব ছিল। এক মুহূর্তের জন্য সন্তানটির গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কাশী কাজটি করতে পারেনি। মাতৃদুগ্ধ ও স্নেহ মমতা দিয়ে সন্তানটিকে সে বড় করতে থাকল। দেখতে দেখতে কেশুর সন্তান কাশীর জীবিকা অবলম্বনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। হাজত ফেরৎ কেশু যখন জানতে পারে উপার্জনক্ষম এই সন্তানের কথা তখন সে আবার কাশীকে আক্রমণ করে। আবার কাশী শোষিতদের দ্বারা শোষিত হয়। সেদিন কাশীকে শুধু কেশুই আক্রমণ করেনি, করেছে সমগ্র পুরুষের দল আর সঙ্গে সমাজের তথাকথিত ভালো মানুষের দল।

"দাঁড়িয়ে থাকা ভালোমানুষের দল কেশুর দাবির প্রতি সমর্থন জানান। তাছাড়া, কাশীর সামান্য সচ্ছলতা তাদের কেউই ভাল চোখে দেখত না। তারা কাশীকে হিংসে করত তাঁর অনিষ্ট চাইত। তাঁদের বাঁধা ধরা বিশ্বাসে আচ্ছন্ন মন যেন কাশীর পতন ঘটাতে চাইল। কেশু এখন নির্বাচনে জয়ী এক সফল প্রার্থী।" (পৃঃ ১০২)

হরিশ মঙ্গলমের 'ধাইমা' গল্পে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি সমাজের তীব্র ঘৃণার আরও একটি রূপ দেখা যায়। আখ্যানটির বক্তা যিনি তিনি প্রকৃতপক্ষে এক একটা প্রজন্মের রক্ষাকর্তৃ। কাজেই 'মা' সম্বোধন করাটা কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয়। 'মা' শব্দটির মধ্যেই এমন পবিত্রতা আছে যে তাঁর সঙ্গে কোনো জাত-পাতের বিষয় ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু বর্ণবিভাজিত হিন্দু সমাজ যে এই পরিত্রতাকেও কালিমা মুক্ত করতে ছাড়েনি। বেনিমা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের একজন বয়স্ক মহিলা। গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা তাঁর হাতেই সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। বড় বড় ডাক্তাররাও যখন হাল ছেড়ে দেয় তখন বেনিমার হাতেই সকলের চিকিৎসা হয়। এমনই এক সত্য ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠে 'ধাইমা' আখ্যানটি। কাহিনির শুরুতেই সমাজের কিছুলোকদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বেনিমা যে ব্যবসা করত তাতে এর পরিচয় পাওয়া যায়, দোকানে সাজানো আমগুলো উচ্চশ্রেণির লোকদের জন্য। পাখিতে ঠোকরানো আমগুলো দলিত শ্রেণির জন্য আর একেবারেই যেগুলো হাত দেওয়া যায় না সেগুলো বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। বেনিমা আমবাছাইয়ের কাজ নিয়েই থাকত আর অন্ধকার খুপড়ির মধ্যেই তাঁর বাকি জীবনটা অবধারিত ছিল। পাশিম মার প্রসব ব্যথা উঠলে ডাক্তার টাকা নিয়েও যখন কোনো চিকিৎসা করে না এবং

পাশিমাকে মরন্মুখে হয়ে উঠতে হয় ঠিক তখনই বেনিমা তাকে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। শুধু তাই নয় বেনিমা তাঁর নরম কোমল হতে দিয়েই পাশিমার সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখার জন্য নিয়ে আসে। বেনিমা কিন্তু সেদিন জানত না যে তারই স্পর্শে এই সন্তানের একদিন জাতচ্যুত হবার আশংকা থাকতে পারে। কয়েক মাস পরে পাশিমা ও তাঁর সন্তানকে দেখে বেনিমার আহ্লাদিত মন তাদেরকে কাছে পেতে চাইলে পাশিমাই এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে ভুলে গিয়েছিল একদিন এই ধাইমার হাতেই তাঁর সন্তানের জন্ম হয়। বেনিমার হাতে নাড়ী কাটার সময় মা ও সন্তানের জাত যায়নি অথচ আজকে তাঁর হাতের স্পর্শ লাগলেই জাত যাওয়ার আশংকা থেকে যায়।

দেবেশ রায়ের দলিত গ্রন্থে কিছু আত্মজীবনীর সংকলনও রয়েছে। কুমদ পাত্তড়ে এক লেখিকা তাঁর শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা এই আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। দলিতদের জীবন সবদিকেই বিষাক্ত করে রেখেছে আমাদের সমাজব্যবস্থা। শিক্ষা জীবনও যে এর থেকে বঞ্চিত নয় এর প্রমাণ পাওয়া যায় কুমুদ পাত্তড়ের 'আমার সংস্কৃত পড়ার গল্প' আত্মজীবনীতে। কুমুদ দলিত সম্প্রদায়ের সাত-আট বছরের একটি ছোট মেয়ে। সে ছোটোবেলা থেকেই এমন কতগুলো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এসেছিল যে তাঁর মনে সমাজ নামক নাটকীয় বস্তুটির প্রতি ঘৃণা জন্মে যায়। কুমুদের মেধার বরাবরই প্রশংসা ছিল শিক্ষা সমাজে। বাড়িতে সে সবসময় অভিভাবকদের কাছে এমনই শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধের জ্ঞান পেয়েছে সে তাতে মেধার মিশ্রণ ঘটিয়ে এক অনন্যময়ী রূপ সে লাভ করতে পারে। নীচুজাতের একটি মেয়ে হয়ে তাঁর এমন রূপ সমাজের কেউ ভালো নজরে দেখেনি। তাঁর উপর নীচু জাতের হয়ে সংস্কৃত শেখার স্পর্ধা দেখে সবাই প্রায় অবাক। কতরকমের অট্টহাসি, টিটকারি, উপহাস কুমুদকে ঘিরে বসে, এরই মধ্য দিয়ে কুমুদ স্কুলে ফাইনাল শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়। একদিকে কুমুদের অধ্যবসায় অপরদিকে সমাজের পিছুটান কুমুদকে একটা টানাপোড়েনের মধ্যে বার বার ফেলে দিচ্ছিল। তাকে এমন কিছু লোক বার বার বাধা দিচ্ছিল যারা তথাকথিত সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্যে কেউওই কিন্তু উচ্চ শ্রেণির বা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত নন। তারা সমাজে সকলের সম অধিকারে এবং সমমর্যাদায় বিশ্বাসী। জ্যাতিবা ফুলের দলিত আন্দোলনে তারাই অংশগ্রহণ করে। অথচ সমজাতীয় কেউ যদি সেই অধিকারকে বাস্তবে রূপান্তিত করতে যায় তখন তারাই তাকে নিয়ে উপহাস বাঁধায়। এমনই এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কুমুদের কলেজের পড়া শেষ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার প্রারম্ভ। সেসময় কুমুদকে এমন এক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় যিনি নিজেই কুমুদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। সেজন্য কুমুদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টা অনেকটা কঠিন ছিল। তবু একটা ভালো সরকারী চাকরী পেয়ে সাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছায় সে তাঁর অধ্যবসায়কে টিকিয়ে রাখল। খুব ভালো পরীক্ষার ফল পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি পুষ্পস্তবক পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান তখন কুমুদ সত্যিই অবাক হয় আর মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে গর্বে যেন উপাচার্যের বুক ফুলে যাচ্ছে। কুমুদ নিশ্চিত ছিল যে ভালো ফলাফল নিয়ে এতদূর পড়াশুনা করার পর তাঁর জন্য নিশ্চয় কোনো বিভাগে কোনো সরকারী চাকরী মজুত থাকবে। তারমত আরও অনেকেই এরকম ভেবে থাকেন এবং ভাবনা নিয়েই সবাই চাকুরীর বাজারে নেমে পড়েন। কুমুদও নামল। কিন্তু হায়। সফলতার চরম শিখরে উঠেও তাকে যে ভুললে হবে না। সে একজন নীচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই দু'বছর তাকে শুধু সরকারী দপ্তরে নয় বেসরকারী দপ্তরে বার বার ঘুরতে হয়। সবার মুখে একই কথা তখন। এত ভালো রেজাল্ট নিয়ে কুমুদ ক'দিন এই সমস্ত দপ্তরে কাজ করবে। দু'দিন পরেই ভালো জায়গায় চাকরী পেলে সে ছেড়ে চলে যাবে। হতাশায় ও ক্ষোভে সে মন্ত্রী মন্ডলীর কাছেও চিঠি লিখে কিন্তু এতেও বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। একটা সময় কুমুদ লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দু'বছর পর কুমুদের বিয়ে হয় অন্যসম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে। আশ্চর্যের বিষয় বিয়ের পর পদবী পাল্টানোর সাথে সাথে কুমুদের ভাগ্যও পাল্টে যায়। ফার্স্ট ইন্টারভিউতেই সরকারী কলেজে অ্যাসিটেন্ট লেকচারারের পদে সে নিযুক্ত হয়। তখন তাঁর মনে কেবলই কতগুলো কথা ঘুরপাক খেতে থাকে—

"—এ চাকরি কুমুদ সোমকুয়ারের বরাতে জোটেনি - জুটেছে কুমুদ পাওড়ের ভাগ্যে। বিয়ের পর শুনেছি মেয়েদের পদবী ও জাত দুই-ই পালটায়। বিয়ের পর আমি কুমুদ পাওড়ে হয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা হলাম। কুমারী কুমুদ সোমকুয়ার কিন্তু রয়ে গেল সেই নিচু জাতেরই - বঞ্চিত ও অবহেলিত।" (পৃঃ ২৪৮)

সংকলক দেবেশ 'দলিত' গ্রন্থটিতে আখ্যান, আত্মজীবনীর, কবিতা ইত্যাদির সংকলন করেছেন ঠিকই কিন্তু এই সংকলনের সাথে সাথে যে এক বৃহত্তর বার্তা তিনি সমগ্র পাঠক মন্ডলীর কাছে পৌঁছে দিয়ে কতটা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। দেবেশ রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নগ্ন বাস্তবতার রূপ নিয়ে উঠে এসেছে পাঠক মন্ডলীর কাছে। স্বাধীনতার এত বছর পর যখন এই বর্ণবিভাজন প্রথা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তখনও কেন এই বিভাজন পদ্ধতিকে নিয়ে লড়াই করতে হয়? আর কেনই বা দেবেশ রায়ের মত লেখকরা আরও অনেকেই কলম তুলতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক পটভূমিতো এই বিভাজন পদ্ধতিকে বার বার ব্যবহার করেছে এবং করছে। আসলে এই বিভাজন পদ্ধতি লুপ্ত হয়ে গেলে নির্বাচনে তাদের ততটা লাভ নাও হতে পারে। তাই সম্ভব থাকলেও এই বর্ণ বিভাজন পদ্ধতিকে লুপ্ত করে দেওয়া অসম্ভব বলে দাঁড় করানো হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১। দেবেশ রায়, দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃঃ ৭
২। তদেব, পৃঃ ৮
৩। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dalit
৪। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dalit
৫। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dalit
৬। দেবেশ রায়, দলিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃঃ ২১